রাষ্ট্রের ‘একছত্র ক্ষমতা’ বা প্লেনারি ক্ষমতা’ এবং ভারতের “শরণার্থী আইন”

ভূমিকা

সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে ‘একছত্র ক্ষমতা’ (plenary powers)। এই ক্ষমতাগুলির ক্ষেত্রে বিচার বিভাগে আলোচনায় ন্যূনতম পর্যালোচনার সুযোগ রাখা হয় এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি বিবেচনা করে এগুলিকে ব্যাপক বা বিস্তৃত বলে মনে করা হয়।

এই ধরনের ‘একছত্র ক্ষমতা’ প্রয়োগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো ‘বিদেশি’ এবং ‘বহিরাগতদে’র বিষয়ে, যা এমন একটি বিষয় যেখানে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ব্যতিক্রমী আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

ভারতে, যেহেতু “শরণার্থী”- বলে কোনো আইনি কোনো গোষ্ঠী নেই, তাই সমস্ত “ শরণার্থী”- এবং আশ্রয়প্রার্থীরা প্রথমে বিদেশি হিসেবে গণ্য হয় এবং সেই কারণে তাঁরা ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন (Foreigners Act, 1946), ১৯৪৮ সালের বিদেশি আদেশ (Foreigners Order, 1948) এবং ১৯৩৯ সালের বিদেশি নিবন্ধন আইন (Registration of Foreigners's Act, 1939) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন।

“শরণার্থী’ অধিকার রক্ষায় আইনি সীমাব্ধতার সত্ত্বেও, বিচার বিভাগের সহায়তায়, আশ্রয়ের দাবিকে সংবিধানের ২১ নং ধারার অধীনে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সেই দাবি জানানোর জন্য UNHCR-এর কাছে যাওয়ার অধিকার, শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার এবং নির্বাসিত না হওয়ার অধিকার।

আশ্রয়প্রার্থী এবং বিদেশিদের পক্ষে কয়েক দশক ধরে লাগাতার দাবির ফলস্বরূপ— দেশের আদালতগুলি বিদেশিদের নিপীড়ন এবং নিপীড়নের হুমকি থেকে রক্ষা করার এবং এইভাবে শরণার্থী আইনকে উন্নত করার প্রতি আগহ দেখানোর চেষ্টা করলেও, "জাতীয় নিরাপত্তা" শব সময় সর্বাধিক অগ্রাধিকার পেয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে, আদালতগুলি প্রায়শই ভারতে থাকার দাবি প্রত্যাখ্যান করে রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ নেয়।

এই নাতিদীর্ঘ নীতিপত্রে বা পলিসি ব্রিফে আমরা বিভিন্ন মামলার আইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে, বিদেশী সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের অবাধ ক্ষমতার যুক্তি, পরিধি এবং সীমা বোঝার চেষ্টা করব।

➔ভারতীয় আইনি ব্যাবস্থায় রাষ্ট্রের বিশেষ বা 'একছত্র ক্ষমতা' রূপরেখা কী?

➔আমরা এই "একছত্র ক্ষমতা'র উৎস কোথায় খুঁজে পাই? কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের 'একছত্র ক্ষমতার' প্রভাব "বিদেশি"দের উপর পড়ছে । কীভাবে এই ক্ষমতা বা একগুছ আইন যার সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্র বিদেশিদের ভাগ্য নির্ধারণে সক্ষম হয় এবং তা তা কার্যকর করা হচ্ছে?

➔ এই নীতিপত্রে কিছু মামলার আলোচনার মাধ্যমে এটি দেখাতে চাই যে অভিবাসী এবং বিদেশিদের সঙ্গে আইনে যেভাবে আচরণ করা হয়, তার মধ্যে সামান্যই যৌক্তিকতা রয়েছে।

বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণকারী সাংবিধানিক পরিকল্পনা

★ সংবিধানের সপ্তম তফসিলের প্রথম তালিকার (List I) ১৭ থেকে ১৯ এবং ৯৭ নম্বর ভুক্তির সাথে পঠিত ২৪৫ এবং ২৪৬ ধারা কেন্দ্রীয় সরকারকে, অর্থাৎ আইনসভাকে, বিশেষ ভাবে বিদেশি, বহিরাগত এবং অভিবাসন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। ২৪৫ ও ২৪৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতের সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভা কোন কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই দুটি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ সংবিধানের সপ্তম

তফসিলের কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List)-এ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে।

এছাড়া, ৭৩(১)(ক) ও (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সংসদের আইন প্রণয়নের অধিকারসম্পন্ন বিষয়গুলোর উপর প্রযোজ্য। একই সঙ্গে, চুক্তির ভিত্তিতে অর্জিত অধিকার ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতা কার্যকর হয়

কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ইউনিয়নের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সঙ্গে এক যোগে কাজ করে।

রাম জাওয়াইয়া বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ৭৩ এবং ১৬২ অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করে রায় দেয় যে এই বিধানগুলি "কার্যনির্বাহী কার্য" কে সঠিক ভাবে স্থির করে না বা এর আওতায় আইনসংগতভাবে কোন কার্যকলাপ আসবে তাও নির্দিষ্ট করে না।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৩ বলতে বোঝায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সেই সমস্ত বিষয়ে প্রসারিত যার উপর সংসদ আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম। সেগুলি কেবল সেই বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ নয় যেগুলির উপর ইতিমধ্যে আইন পাস করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান ক্ষমতার ভাগের মতবাদ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না; এটি অধস্তন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভা যেমন রাজ্য বিধানসভায় এই আইন পাশ হলেও তা প্রয়োগ করতে পারে। এটি সীমিত আকারে বিচার বিভাগের কাজও পালন করতে পারে তবে সংবিধান বা অন্য কোনো আইনের বিধানের বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

পূর্ববর্তী আলোচনাটি তিনটি উপায়ের কথা বলে
যার মাধ্যমে একটি বৈধ আইন তৈরি করা যেতে পারে।

কোনো আইন বা নীতি কার্যকর করার জন্য মূলত তিনটি উপায় রয়েছে—

১. সংসদে পাস হওয়া একটি বিলের মাধ্যমে, অর্থাৎ নতুন আইন প্রণয়ন করে।

২. বর্তমানে কার্যকর কোনো আইনের আওতায় অর্পিত বা অধস্তন আইন (Subordinate/Delegated Legislation) তৈরি করে।

৩. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৩ অনুযায়ী সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে।

এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সংসদ প্রণীত আইন, অর্পিত (অধস্তন) আইন এবং বিচারকদের ব্যাখ্যা ও রায়ের মাধ্যমে গঠিত আইন—এই তিনটির একটি অনির্ধারিত সমষ্টিই 'শরণার্থী আইন' হিসেবে গড়ে উঠেছে।

❖ শরণার্থীর মর্যাদা নির্ধারণ, নন-রিফাউলমেন্টের নীতি (অর্থাৎ কাউকে জোর করে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেরত না পাঠানো) এবং শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার পাওয়ার সুযোগ—এই সবই ভারতের সংবিধানের সমতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪) এবং জীবনের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১)-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত।

সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে থাকা আরও কিছু বিধান শরণার্থীদের সরাসরি সুরক্ষা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ম পালনের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৫), গ্রেপ্তার, আটক ও ফৌজদারি বিচার সংক্রান্ত অধিকার (অনুচ্ছেদ ২০ ও ২২), এবং আইনি ও সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩২ ও ৩৯-ক)।

তবুও, এই "আইনগুলি" স্থায়ী নয়; এগুলি প্রায়ই পরিবর্তিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগের কোনো নিশ্চিততা থাকে না। এই আইনি কাঠামোর ধারাবাহিক পরিবর্তন ভারতে প্রচলিত জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কিছু উদ্বেগ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, আবার কিছু বিষয় অনুমান ও ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে—দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদের প্রবেশ এবং অভিবাসীদের ধর্মীয় পরিচয়।

তাহলে একছত্র বা প্লেনারি ক্ষমতা কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে? অভিবাসীদের উত্থাপিত দাবি ও আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে আদালত কি কখনও সংযত বা পিছিয়ে থাকে—এবং যদি থাকে, তাহলে কোন পরিস্থিতিতে? পাশাপাশি, আমরা কি এমন

কোনো ধরণ লক্ষ্য করতে পারি যেখানে প্লেনারি ক্ষমতা শুধু আদালতের সমর্থনই পায় না, বরং আদালতের সামনে থাকা বিষয়গুলিতেও কেন্দ্রীয় সরকার তা পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করে?

নিম্নলিখিত অংশে ভারতের বিভিন্ন উচ্চ আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা নানা শ্রেণীর আবেদনকারীদের মামলায় দেওয়া রায়গুলির একটি সামগ্রিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

একছত্র বা প্লেনারি ক্ষমতা

আমেরিকার আইনি প্রেক্ষাপটে একছত্র বা প্লেনারি ক্ষমতার উৎপত্তি, অর্থ ও প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা রয়েছে। বর্তমানে এটি একটি স্বীকৃত আইনি নীতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নিয়মিতভাবে অভিবাসন আইনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। এই প্লেনারি ক্ষমতার মতবাদের সুত্রপাত হিসেবে সাধারণত Chae Chan Ping বনাম United States মামলাটিকে ধরা হয়। ওই মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিচার বিভাগের নয়, বরং আইন প্রণয়নকারী ও কার্যনির্বাহী শাখার কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতে বিদেশিদের সম্পর্কিত মামলাগুলিতে একছত্র বা প্লেনারি ক্ষমতার মতবাদের প্রয়োগ এই অংশে আলোচিত হয়েছে।

এখানে যে মামলাগুলি আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি ভারতীয় আইনি প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ (precedential value)

➤ভারতে শরণার্থী হিসেবে বিদেশিদের অধিকার প্রয়োগের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা না থাকলেও, গত চার দশকে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে যে সিদ্ধান্তগুলি দিয়েছে, সেগুলিই এসব অধিকার দাবির আইনি ভিত্তি

গড়ে তুলেছে এবং এখনও তা করে চলেছে। এই সিদ্ধান্তগুলি কেবল মানবিক বা ন্যায়বিচারের বিবেচনার ওপর নয়, বরং আইনি যুক্তির ওপর নির্ভর করেই দেওয়া হয়েছে।

➤ এই ব্রিফটী পাঠককে বুঝতে সহায়তা করে যে, সংবিধান ও তার তৃতীয় অংশের অধীনে বিদেশি এবং শরণার্থী হিসেবে বিদেশিরা যখন বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রতিকার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়, তখন আদালত কীভাবে সেই বিষয়গুলির মোকাবিলা করে।

➤ এখানে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে বিচারকরা রাষ্ট্রের "প্লেনারি ক্ষমতা" স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করে বরং সেটিকে ধরে নিয়েই প্রয়োগ করেছেন।

পাঠককে আরও লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে যে আদালত কীভাবে রাষ্ট্রের দাবি ও বক্তব্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এই শ্রদ্ধা উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়—যখন আবেদনকারীদের শরণার্থী হিসেবে অধিকার মঞ্জুর করা হয় এবং যখন জাতীয় নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কারণ দেখিয়ে তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখানে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে আদালতের এই শ্রদ্ধা প্রায় সম্পূর্ণ, অর্থাৎ এমন অনেক প্রশ্ন আদালত তোলে না, যা স্বাভাবিকভাবে তোলা প্রত্যাশিত হতে পারত। বিদেশিদের সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে 'প্লেনারি ক্ষমতার' এই বিশ্লেষণ আমাদের সেই প্রতিষ্ঠিত আইনি অবস্থানকে নতুন করে পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়—যেখানে বলা হয় যে সকল ব্যক্তিই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ ও ২১-এর অধীনে মৌলিক অধিকার ভোগ করেন।

একদিকে প্রশ্ন উঠে আসে—কখনও কখনও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করা বা যুক্তিহীনভাবে প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের *প্লেনারি ক্ষমতা*-র ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ কী, অথচ একই সঙ্গে বলা হয় যে কিছু মৌলিক অধিকার অ-নাগরিকদের জন্যও প্রযোজ্য।

★ আবার, যদি সংবিধানের পরবর্তী বিধানগুলি এমন একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে, যা অতিক্রম করলে কোনো সিদ্ধান্তকে স্বেচ্ছাচারী ও অসাংবিধানিক বলা যায়, তাহলে বাস্তবে কার্যনির্বাহী ও বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তগুলি কি সেই সীমার মধ্যে সত্যিই সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে?

ভারতে একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্লেনারি ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের প্রাচীনতম রায়গুলির মধ্যে একটি হলো হান্স মুলার অফ নুরেমবার্গ বনাম সুপারিনটেনডেন্ট, প্রেসিডেন্সি জেল, কলকাতা ও অন্যান্য মামলা।

এই মামলায় আবেদনকারী হান্স মুলার ছিলেন একজন পশ্চিম জার্মান নাগরিক। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ৩(১)-এর অধীনে তাকে প্রতিরোধমূলক আটক রাখা হয়। তার আটক ও প্রস্তাবিত বহিষ্কারের ভিত্তি ছিল এই যে তিনি ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ অনুযায়ী একজন বিদেশি।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা এই রিট পিটিশনটি ছিল হান্স মুলারের দ্বিতীয়বারের আবেদন। এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট তার আবেদন খারিজ করেছিল। হাইকোর্টে তিনি একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করে দাবি করেন যে তাকে বেআইনিভাবে আটক রাখা হয়েছে এবং তার বহিষ্কারের জন্য কোনো বৈধ আদেশ জারি করা হয়নি।

এই সময়ে ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি দিয়ে জানায় যে আবেদনকারী জার্মানিতে সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত এবং তাকে সে দেশে প্রয়োজন। পাশাপাশি, তারা তার প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করার কথাও জানায়।

সুপ্রিম কোর্টে হান্স মুলার যুক্তি দেন যে তার আটক অবৈধ, কারণ—

প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ৩(১)(খ) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ২১ ও ২২ লঙ্ঘন করে।
উক্ত ধারা অনুচ্ছেদ ২২(৩)-এর অর্থে প্রতিরোধমূলক আটক সংক্রান্ত আইন নয়; ফলে এটি অনুচ্ছেদ ২২(১) ও ২২(২)-এরও পরিপন্থী।
তার বিরুদ্ধে জারি করা আটকাদেশটি অসৎ -উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (mala fide) ছিল।
সুপ্রিম কোর্ট এই সব যুক্তি গ্রহণ না করে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেয় এবং বিদেশিদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্লেনারি ক্ষমতাকে কার্যত স্বীকৃতি প্রদান করে।

ভারতে বিদেশিদের অধিকার এবং ভারতে কোনো আইন আছে কিনা যা কার্যনির্বাহী সরকারকে একজন বিদেশীকে প্রত্যর্পণের পরিবর্তে বহিষ্কার করার ক্ষমতা দেয়, এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট

রায় দেয় যে, প্রথমত, ভারতের ভূখণ্ডে অবাধে চলাফেরা করার এবং ভারতের যেকোনো অংশে বসবাস ও স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার একজন বিদেশীর জন্য উপলব্ধ নয়।

- তাদের জন্য যা নিশ্চিত করা হয়েছে তা হলো দেশের আইন অনুযায়ী জীবন এবং স্বাধীনতার সুরক্ষা।
- দ্বিতীয়ত, এটি রায় দেয় যে ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ ভারতের কেন্দ্র সরকার বিদেশীদের বহিষ্কার করার ক্ষমতা দেয়।

এ ব্যপারে সরকারকে প্রভূত এবং অবাধ বিবেচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সংবিধানে এই বিবেচনার উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করার কোনো বিধান না থাকায়, বহিষ্কারের একটি অবাধ অধিকার সরকারে আছে।

লুই ডি রেডিট ও অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় আবেদনকারীরা ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে জারি করা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেন। ওই আদেশগুলির মাধ্যমে তাদের ভারতে থাকার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবেদনকারীদের যুক্তি ছিল যে এই আদেশগুলি স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক।

লুই ডি রেডিট আদালতে দুটি প্রধান যুক্তি উত্থাপন করেন। প্রথমত, তিনি দাবি করেন যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫(গ)-এর ভিত্তিতে তিনি ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে গিয়েছিলেন; ফলে তাকে বিদেশি হিসেবে গণ্য করে বহিষ্কার করা যায় না। অন্যদিকে তিনি যুক্তি দেন যে, যদি তাকে বিদেশি হিসেবেও ধরা হয়, তবু বহিষ্কারের ক্ষমতা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি মেনে প্রয়োগ করতে হবে এবং বহিষ্কারের আগে তার বক্তব্য শোনার অধিকার রয়েছে।

তবে আদালত আবেদনকারীর এই যুক্তিগুলি গ্রহণ করেনি।

অনুচ্ছেদ ৫(গ) সংক্রান্ত প্রশ্নে আদালত রায় দেয় যে, “আবেদনকারী নিজেই যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারতে তার কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না।”

আদালত আরও উল্লেখ করে যে আবেদনকারীর ভারতে স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, কারণ তার আবেদনে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যে তিনি এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান। বরং, যে সময়ের জন্য তিনি থাকার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন, তা ছিল মাত্র এক বছর। আদালতের মতে, এটি প্রমাণ করে যে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।

> আরও বলা হয় যে "শুধুমাত্র বসবাস, মনের এই অবস্থা ছাড়া [অর্থাৎ, এই প্রমাণ যে তিনি বসবাসের দেশে তার স্থায়ী বাড়ি তৈরির এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় গঠন করেছেন], অপর্যাপ্ত।"

অনুচ্ছেদ ১১-এ আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করে যে আবেদনকারীরা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে কেবল তাদের পাসপোর্টের ভিত্তিতেই ভারতে থাকার সিধান্ত নিয়েছিলেন। তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকার অনুমতি বারবার চেয়েছিলেন। আদালতের মতে, এই প্রসঙ্গে আবেদনকারীদের দায়ের করা কোনো আবেদনেই—এমনকি দূরবর্তীভাবেও—এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অভিপ্রায় গড়ে তুলেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ১২-এ আদালত এই উপসংহারটি আবারও উল্লেখ করে জানায় যে আবেদনকারীরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কেবল বিদেশি পাসপোর্টের ভিত্তিতেই ভারতে থাকতে বেছে নিয়েছিলেন।

বিদেশিরা সংবিধানের অধীনে সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করে—এই যুক্তি খারিজ করে আদালত রায় দেয় যে বিদেশিদের মৌলিক অধিকার মূলত অনুচ্ছেদ ২১-এ বর্ণিত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আদালত স্পষ্ট করে জানায় যে এর মধ্যে অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ঙ)-এর অধীনে ভারতে বসবাস বা স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই প্রসঙ্গে আদালত হান্স মুলার অফ নুরেমবার্গ বনাম সুপারিনটেনডেন্ট, প্রেসিডেন্সি জেল, কলকাতা মামলার ওপর নির্ভর করে, যেখানে রায় দেওয়া হয়েছিল যে—

ভারত সরকারের বিদেশিদের বহিষ্কার করার ক্ষমতা পরম ও সীমাহীন, এবং সংবিধানে এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট আইনি সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়নি।

ভারতের ক্ষেত্রে আদালত মন্তব্য করে যে, "নির্বাহী সরকারের একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করার ক্ষেত্রে অবাধ অধিকার রয়েছে।" একজন বিদেশীর বক্তব্য পেশ করার অধিকার আছে—এই যুক্তির প্রসঙ্গে আদালত রায় দেয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কঠোর বা নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত নিয়ম অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা নেই।

১৩, পৃ.৫৬২)

শরণার্থীদের সংশ্লিষ্ট মামলাগুলি শুধু উপরে উল্লেখিত এই দুটি সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেনি; বরং কিছু ক্ষেত্রে সেগুলি এই দুই রায়ে প্রতিফলিত সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিকেও অতিক্রম করেছে

চাকমা শরণার্থীদের মামলা বিচার বিভাগের উদার মনোভব একটি উদাহরণ, যেখানে জাতীয়তা নিরাপত্তার প্রশ্নগুলি সর্বাগ্রে আসেনি।

চাকমারা একটি উপজাতি, যারা ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে। ১৯৬০-এর দশকে তারা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসে এবং ১৯৬৪ সালে ভারত সরকারের শরণার্থী ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নীতির আওতায় ভারতে পাকাপাকি ভাবে থাকার পরিকল্পনা নেয়। গত কয়েক দশক ধরে চাকমা শরণার্থীরা কখনও ব্যক্তিগতভাবে, আবার কখনও যৌথভাবে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে—উচ্ছেদ রোধ এবং নাগরিকত্ব লাভের আশায়।

অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম খুদিরাম চাকমা মামলায় গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়ের যথার্থতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। গুয়াহাটি হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপিলকারীদের—খুদিরাম চাকমা ও আরও ৫৬টি পরিবারকে—জয়পুর থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ বৈধ ছিল এবং ওই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোনো অধিকার তাদের নেই। এই আদেশ ও রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তগুলি বুঝতে সহায়ক হিসেবে নিচে মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলি তুলে ধরা হলো।

আপিলকারী খুদিরাম চাকমা ও আরও ৫৬টি পরিবার ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আসে। প্রথমে তাদের আসামের ডিব্রুগড় জেলার লেগো এলাকায় অবস্থিত একটি সরকারি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে, ১৯৬৬ সালে তাদের অরুণাচল প্রদেশের মিয়াও অঞ্চলের একটি শিবিরে স্থানান্তর করা হয়। একই বছরে অরুণাচল প্রদেশ সরকার একটি চাকমা পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করে, যার অধীনে গৌতমপুর ও মৈত্রিপুর গ্রামে তাদের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়।

তবে ওই গ্রামগুলিতে বসবাস না করে, আপিলকারীরা ১৯৭২ সালে স্থানীয় রাজার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি অনিবন্ধিত দলিলের ভিত্তিতে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে বসতি স্থাপন করে। পরে, ১৯৭৩ সালে খুদিরাম চাকমাকে জয়পুর গ্রামের গাঁও-বুড়া (গ্রামপ্রধান) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

আপিলকারীদের অভিযোগ অনুযায়ী, জমির উর্বরতার কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু বাসিন্দা তাদের বসতির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে। তাদের দাবি ছিল যে ওই জমিগুলি শরণার্থী বসতির জন্য ব্যবহার করা যায় না। পাশাপাশি চাকমাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগও তোলা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দেয় যে আপিলকারীদের জয়পুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোনো অধিকার ছিল না এবং কর্তৃপক্ষ তাদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আইনসঙ্গত কাজ করেছে। আদালত চাকমাদের বিরুদ্ধে চুরি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের মতো অভিযোগের কথাও উল্লেখ করে।

তবে একই সঙ্গে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে উচ্ছেদের ফলে আপিলকারীরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

হাইকোর্টে আপিলকারীরা যুক্তি দিয়েছিল যে তারা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৬-ক অনুযায়ী ভারতের নাগরিক এবং তাই রাজ্য সরকারের উচ্ছেদ সংক্রান্ত আদেশটি অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারী। তারা আরও দাবি করে যে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্টের জন্য হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাই করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় মূলত হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়। আদালত মত দেয় যে জয়পুরে আপিলকারীদের বসবাসের জন্য স্থানীয় রাজার দেওয়া দান আইনসম্মত ছিল না। পাশাপাশি, আদালত আরও বলে যে আপিলকারীরা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৬ক-এর অধীনে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারে না, কারণ ওই ধারার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি তারা পূরণ করেনি। আদালত এটাও লক্ষ্য করে যে আপিলকারীদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য একাধিক সুযোগ দেওয়ার পরেই তাদের সরিয়ে দেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছিল।

তবে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে যে উচ্ছেদের জন্য আপিলকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। আদালতের যুক্তি ছিল যে আপিলকারীদের জমির দখল শুরু থেকেই বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন, ১৮৭৩ এবং ফরেনার্স অর্ডার, ১৯৪৮-এর ধারা ৯(৩)-এর পরিপন্থী ছিল।

প্রথম দৃষ্টিতে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলেও, আদালতের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এবং উভয় পক্ষের উপস্থাপিত তথ্য ও যুক্তি বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে মামলাটি যেভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উদ্বেগ উঠে আসে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে চাকমারা রাষ্ট্রের স্বীকৃতিতেই শরণার্থী হিসেবে ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং সেই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই তাদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইনের অধীনেও শরণার্থীরা যে দেশে বসবাস করে, সেই দেশের আইনের অধীনেই থাকে—যেমন অন্য যে কোনো ব্যক্তি।

এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে রাজ্য সরকার চাকমা পরিবারগুলিকে স্থানান্তর করতে চেয়েছিল মূলত এই অভিযোগে যে তারা সুরক্ষিত এলাকার অবৈধ দখল করেছে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছে, অপরাধমূলক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল এবং অন্যান্য উপজাতিদের জন্য "নিরবচ্ছিন্ন সমস্যার উৎস" হয়ে উঠেছিল।

তবে লক্ষণীয় যে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে আদালত আলাদাভাবে কোনো বিশদ বিশ্লেষণ বা পর্যবেক্ষণ করেনি। বরং উচ্ছেদের সরকারি আদেশকে সমর্থন করার জন্যই এই অভিযোগগুলিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের মতো চাকমা শরণার্থীরাও এসব অভিযোগের কারণে নির্বাসনের মুখে পড়েনি।

সুপ্রিম কোর্ট আরও জানায় যে আপিলকারীদের কর্তৃপক্ষের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি, রাজ্যের পক্ষ থেকে দাখিল করা বক্তব্যের পর আপিলকারীদের একটি "সিদ্ধান্ত-পরবর্তী শুনানি" দেওয়াও হয়েছিল।

এর সঙ্গে *লুই ডি রেডিট বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া* মামলার রায়টির তুলনা করা যেতে পারে। ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কঠোর বা নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত নিয়ম নির্ধারণ করা যায় না।

> আদালতগুলির আচরণে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—এবং তা শুধু কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেই নয়—তা দেখায় যে কীভাবে প্লেনারি ক্ষমতা, অর্থাৎ এমন ব্যাপক ক্ষমতা যা সরাসরি

কোনো বিধিবদ্ধ ক্ষমতার দ্বারা সমর্থিত নয়, অনেক সময় অজান্তেই বিদেশিদের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলিতে প্রভাব ফেলেছে

অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম খুদিরাম চাকমা মামলাটি স্পষ্ট করে যে "জাতীয় নিরাপত্তা" অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগের চেয়ে বেশি করে ভারতীয় রাষ্ট্র যা বিশ্বাস করে বা যেভাবে বিষয়টিকে উপলব্ধি করে, তারই প্রতিফলন।

উপরে আলোচিত মামলাগুলির সঙ্গে আচরণে ভিন্ন হলেও পুরোপুরি ভিন্ন নয়—এই প্রবণতাই আবার দেখা যায় বার্মিজ শরণার্থীদের ক্ষেত্রে, যেখানে রোহিঙ্গাদের আলাদা একটি শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

বার্মিজ শরণার্থীদের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে—

- আশ্রয়ের জন্য UNHCR-এর কাছে যাওয়ার অধিকার,
- জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা তাদের আবেদন বিবেচনা না করা পর্যন্ত নির্বাসিত না হওয়ার অধিকার, এবং
- ভারতে আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার।

তবে পরবর্তী কিছু আদালতের সিদ্ধান্তে এই নীতিগুলির প্রয়োগ অভিন্ন ছিল না।

লাল ত্লান লাউম বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য মামলায় আবেদনকারীর স্ত্রী দিল্লি হাইকোর্টে একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন দায়ের করেন। তিনি দাবি করেন যে তার স্বামীকে অবৈধভাবে আটক রাখা হয়েছে এবং তাকে নির্বাসিত করা উচিত নয়, কারণ তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ দীর্ঘমেয়াদী ভিসাসহ একজন স্বীকৃত শরণার্থী।

আবেদনকারীর স্বামীকে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর অধীনে মামলার পর গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। তিনি তার সাজা সম্পূর্ণ করার পর FRRO-র সামনে হাজির হন, যেখান থেকে তাকে একটি ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়। এরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাকে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তটি গভীরভাবে পরীক্ষা করে। আদালত লক্ষ্য করে যে সরকার নির্বাসন সংক্রান্ত নিজস্ব নির্দেশিকা অনুসরণ করেনি—যেখানে বলা ছিল ছয় মাসের মধ্যে নির্বাসন প্রক্রিয়া

সম্পন্ন করতে হবে। এই ব্যর্থতাকে আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১-এর অধীনে আবেদনকারীর অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে।

হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিলম্বের কারণে আবেদনকারীর স্বামীর চলাফেরার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করা যায় না। ফলে আদালত তাকে অস্থায়ী মুক্তির নির্দেশ দেয় এবং জানায় যে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ, জামিনের শর্ত পালন এবং মাসিক পুলিশ রিপোর্টিং—এই সবই নির্বাসন কার্যকর হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে যথেষ্ট।

এই মামলাটির তুলনা করা যেতে পারে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম খুদিরাম চাকমা মামলার সঙ্গে, যেখানে চাকমা শরণার্থীদের বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন।

আরও তুলনা করা যেতে পারে রাজ্য বনাম চন্দ্র কুমার ও অন্যান্যদের মামলার সঙ্গে, যা ছিল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের একটি রায়। সেখানে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও একজন শ্রীলঙ্কান তামিল শরণার্থীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তার সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইনের উপর নির্ভর করেন এবং তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

উপসংহার

➤ এই সারসংক্ষেপটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় প্রেক্ষাপটে "প্লেনারি ক্ষমতা"-র পরিধি, কাঠামো ও সীমারেখা বোঝা—বিশেষ করে আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তার নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতসহ। ভারতে শরণার্থীদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কার্যকরীকরণ আদেশ জারি করা হয়। এর পাশাপাশি, বলার অপেক্ষা রাখে না যে আদালতগুলিও তথাকথিত "শরণার্থী আইন" কাঠামো গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

➤এই প্রেক্ষিতে, প্রবন্ধটি মূলত যে কেস-আইন বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছে, তা হলো—আদালতগুলি কীভাবে প্লেনারি ক্ষমতাকে বিবেচনা করেছে এবং সেই ক্ষমতার বিস্তৃতি কতটা স্পষ্টভাবে তারা চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করেছে।

ভারতের আদালতগুলির বিভিন্ন রায়ে দেখা যায়, প্লেনারি ক্ষমতার কাঠামো এখনো সম্পূর্ণভাবে সুসংহত নয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি নীরব অনুমান কাজ করে—রাষ্ট্রের প্লেনারি ক্ষমতাকে সম্মান জানানো উচিত।

➤এই আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্লেনারি ক্ষমতার সাংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি গভীরভাবে বিবেচনা করা জরুরি।

লেখক: সাহানা বাসবপত্তন। তিনি ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ (CRG)-এর একজন সদস্য এবং বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে আইন পেশার সঙ্গে যুক্ত। সাহানা দেওয়ানি, ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক মামলায় আইনি দক্ষ আইনজীবী হিসাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর আগে, নয়াদিল্লিতে থাকার সময় তিনি জোরপূর্বক অভিবাসন এবং শরণার্থী/আশ্রয়প্রার্থীদের বিষয় নিয়ে গবেষণা মূলক ও আইনি পরামর্শ দানের কাজ করেছেন। পরে বেঙ্গালুরুর আদালতে আশ্রয়প্রার্থীদের আইনি সহায়তাও প্রদান করেছেন। ২০২৪ সালে তিনি CRG-এর “বিচার, নিরাপত্তা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দুর্বল জনসংখ্যা” শীর্ষক গবেষণা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই প্রকাশনাটি সেই গবেষণারই একটি অংশ।